শুন্য নীড়ে বিষন্ন পাখি

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি

আমাদের রোমানা একাই নায়রে এসেছে। এবার ওকে আনতে যেতে হয়নি। আসবে না? আজ সকালে কুটুম পাখী ডেকেছে যে! কুটুম পাখীর ডাক কি মিথ্যে হতে পারে? কটুম পাখীই তো রোমানার আগমন বার্তা জানিয়ে দিয়েছে।

রোমানা নায়রে এল অথচ পাড়াসুদ্ধ সকলের আনন্দ কই? মেহমান এলে বুঝি মুখ গোমড়া করে থাকতে হয় ? সবাই কি ভুলে গেছে মেহমান এলে খাবার-দাবারের ব্যাবস্থা করতে হয়। ওরে তোরা কোথায়? এদিকে আয়....'মোরগটা ছাড়িস্‌নে ...চাল গুলো পিশে নে তাড়াতাড়ি...কতদিন হয় মেয়েটা পিঠে পায়েস খায়নি।

না কেউ এলো না। সবাই যেন ক্যামন হয়ে গেছে। আচ্ছা ওরা নাই বা এল মেয়েটা কি উঠে গিয়ে সব করতে পারে না? নিজের বাড়ী, নিজের ঘর, সবইতো নিজের। নিজের হাতে সবকিছু করে খেয়ে–দেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেলেই হয়। গতবার তো এমন করে বলতে হয়নি। একাই সবকিছু করে পাড়া–প্রতিবেশীদের বিলিয়ে তারপর চলে গেল। ও রোমানা উঠ আর অভিমান করে থাকিস নে – না হয় এবার নায়রে আনতে দেরীই হয়েছে। তাই বলে এত অভিমান !

কিন্তু রোমানার আর অভিমান ভাঙেনা। চোখ - দুটো বোঁজা গভীর নিদ্রায়। কথার প্রতিউত্তর দেবার ক্ষমতা কে যেন হরণ করেছে। কাজ করার সমস্ত শক্তি উড়ে গেছে বলে নিথর দেহটা মাটির ওপরে পড়ে রয়েছে। পাশে শায়িত সদ্য আগত পূর্নিমা চাঁদের ন্যায় ফুটফুটে তার গর্ভজাত সন্তান। সেও মায়ের মতই নিরব–নিথর হাত পা পর্যন্ত নাড়ানোর ক্ষমতা নেই। সত্যি কে বলবে এ আমাদের রোমানা, যে কোনখানে স্থির হয়ে বসে থাকত না– সারাদিন টই টই করে পাড়া বেড়ানোই ছিল যার অভ্যাস। কি চঞ্চলই না ছিল রোমানা! সারা পাড়া ঘুরে বেড়াতো আর সবার মনে আনন্দ সঞ্চার করত। কিন্তু সে আনন্দ গেল কোথায়? আজ তার দিকে তাকাতে ভয়ে আমার রক্ত একেবারে হিম হয়ে আসে কেন?

রোমানা আমার এক আত্নীয়া সম্পর্কে ফুফাতো বোন। বয়সে আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট। মা–বাবাহীন এই এতীম বালিকাকে আমার বাবা নিজের কাছে নিয়ে এলেন। ছোটবেলা থেকেই আমরা একসাথে বড় হয়েছি। আমার কোন বোন ছিল না সেই সূত্র ধরে বাবা–মা তাকে নিজের কন্যার মতই দেখতেন। কোন কিছুর অভাব বুঝতে দিতেন না। আমরা দুজনও কত মান–অভিমান , মারামারি, ঝগড়াঝাটি করে বড় হচ্ছিলাম। বছর দু'য়েক আগের কথা, আমি তখন এস,এস,সি পরীক্ষার্থী আর রোমানা প্রাইমারী পাশ করে হাইস্কুলে প্রবেশ করেছে। সবেমাত্র যৌবনের আলো এসে লেগেছে ওর চোখে–মুখে। বয়ঃসন্ধিকালের দুরন্তপনায় অস্থির, অশান্ত। কর্পূরের মত সদাই যেন বাতাসে ভেসে বেড়ায়। দেখতে ও ওছিল যথেষ্ট সুন্দর। দো–হারা গঠন আর চেহারাটা ছিল আপেল রঙের।

একদিন কাক ডাকা ভোরে – বোধ করি মাঘের শীতের মাঝামাঝি,কখন যে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তা টের ও পাইনি। আমি তখন লেপ মুড়ি দিয়ে মোষের মত ঘুমাচ্ছি। গায়ের ওপর থেকে লেপটা টেনে ফেলে দিয়ে জোর করে আমার হাতটা ধরে টেনে তুলল। তারপর হিড় হিড় করে টেনে আমাকে বাইরে বের করে নিয়ে গেল।

আমাদের বাড়ীতে ছিল দু'টো গেট। সম্মুখে চলার আর পিছনের গেট দিয়ে পুকুর ঘাটে যাবার। পেছনের গেট দিয়ে আমাকে পুকুর ঘাটে নিয়ে গিয়ে বলল –এখানে বসো। আমার চোখে মুখে তখন ও ঘুমের ভাব। বিরক্ত প্রকাশ করে বললাম – তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? এই ঠান্ডার মধ্যে আমি, এসব কি করে? রোমানা জোর করে আমাকে শান বাঁধানো পুকুর ঘাটটায় বসিয়ে ছিল। ঠান্ডায় যেন আমি জমে যাচ্ছি। কিন্তু কি করব? উঠবার ও উপায় নেই। উঠলেই চীৎকার চেঁচামেচী শুরু করে দেবে। আর এই সাত–সকালে ওর চীৎকার চেঁচা–মেচী শুনে বাবা মা জেগে উঠে আমাকেই তিরষ্কার করবেন। তাই অবাধ্য হওয়া সত্বেও একেবারে বাধ্য ছেলের মত বসে রইলাম। রোমানা আমার পায়ের কাছটায় বসে পড়ল। তারপর পুকুরের মাঝখানটার দিকে আঙুল উঁচিয়ে আমাকে বলল – দেখেছ রাহাত ভাই, কি সুন্দর দু' টি ফুল মুখোমুখি ফুটেছে! আমি চোখ তুলে চাইলাম। কুয়াশাচ্ছন্ন চাঁদনী রাতের ম্লান আভা বাঁশঝাড়ের মাঝখান দিয়ে এসে পড়েছে ফুল দু'টির উপর। পুকুরে বেশ বড় বড় মাছ ছিল। মাছ গুলির দু'একটি যখন ঢেউ তুলছে সেই ঢেউয়ের দোলায় ফুল দু'টি আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচছে।

বাস্তবিকই ফুল দু'টি ছিল খুবই সুন্দর। বিশাল আকাশের মাঝে অসংখ্যা তারকারাজীর মাঝে শুকতারা যেভাবে জ্বল জ্বল করে জ্বলে তেমনি ভাবে যেন জ্বলছে। আমি যদি কবি হতাম তবে ফুল দু'টির দিকে চেয়ে দু'ছত্র কবিতা লিখতাম। কিন্তু বাস্তব জীবনে তা আর কখনো সম্ভব হলোনা তাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলাম। হঠাৎ রোমানার প্রশ্নবাণে আবার ও সম্বিৎ ফিরে পেলাম।
– কি ভাবছ?
– সত্যি ফুল দু' টো সুন্দর!
– আমাকে এনে দেব একটা?
– যা শীত- ওখানে নামলে আমি মরেই যাবো!
– শীত না ছাই! তুমি আসলে অলস, ভীতুর ডিম।
ঠোঁট বাঁকিয়ে কথাগুলো বলে উঠে গেল। তারপর একেবারে পানির নিকটে গিয়ে ইটের ওপর বসে মাঘের বেজায় শীত উপেক্ষা করে পা দু'টোকে পানির ওপর রেখে ঢেউ ঢেউ খেলতে লাগল। ক্ষণকাল এমনি কেটে যাবার সময় দুই হাত দিয়ে কিছু পানি আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। পানির ঝাপটায় যখন আমি চম্‌কে উঠলাম তখন ও খিল্ খিল্ করে হেঁসে উঠল। হাসির শব্দ বিচ্ছুরিত ভাবে পুকুরের পানিতে পড়ে যে প্রতিধ্বনী সৃষ্টি করল সেই প্রতিধ্বনী শুনে বাঁশবনে বিশ্রামরত পাখির দল সজাগ হয়ে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যেতে লাগল।

আমি তন্ময় হয়ে দেখছি ওর এহেন কান্ডকীর্তি। বুঝতে পারছিনা কেন ও এমন করছে। আমাকে এভাবে পুতুলের মত বসিয়ে রেখে এমন করার অর্থ কি? কিছুক্ষণ পর সে উঠে এসে

আমার মুখোমুখি ঝুপ করে বসে পড়ল আর বলল– একটা গল্প শুনবে? গল্প শুনার ঝোঁক আমার কোনকালেই ছিল না। দাদীমা যখন বেঁচে ছিলেন তখন আমরা সকলে গোল হয়ে বসে এমনি শীতের দিনে আগুন তাপাতে তাপাতে গল্প শুনতাম। আমি কোন দিন ঠিকমত একটি গল্প ও শুনি নি। রোমানা মশগুল হয়ে গল্প শুনত আর আমি অন্যমনস্ক হয়ে আকাশের তারার দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতাম। দাদীমা যখন প্রশ্ন করতেন আর আমি অ্যাঁ...অ্যাঁ...করতাম তখন রোমানা খিল্ খিল্ করে হেঁসে উঠে বলত "বুদ্ধু" কিন্তু কেন জানি রোমানার গল্প শুনতে সাধ জাগল তাই প্রতিউত্তরে বললাম– বল।

আমার সমর্থন পেয়ে খুশীতে ওর চোখ–মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে বলতে আরম্ভ করল।

– একদেশে ছিল এক রাজকুমার

– বেজায় অলস। সারারাত শুধু ঘুম আর ঘুম। সেই রাজকুমারের রাজ্যে এল রাজকন্যা। রাজা–রাণী তো মহাখুশী! খুশী হবে না? রাজকণ্যার দায়িত্ব পড়ল যে রাজকুমারকে দেখার! যা অলস রাজকুমার! ঠিকমত খেতে চাইতনা,স্কুলে যেতে চাইত না-যতক্ষণ জেগে থাকত শুধু বই আর বই, আর যেন কোন কাজ নেই। গল্পের মাঝখানে ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম–দাদীমার কাছে শুনেছিস বুঝি? আমার কথা শুনে ওর হাসিভরা উজ্জল মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে আমাকে ঠেলা দিয়ে একেবারে কাৎ করে ফেলে দিল। তারপর গুটি গুটি পায়ে পুকুর ঘাট অতিক্রম করে একেবারে পানিতে নেমে পড়ল। পুকুরে পানি বেশী ছিল না। বড়জোর খাড়ু পানি। ফুল দু'টোর কাছে গিয়ে দু'টো ফুলই টেনে তুলল। তারপর উঠে এসে একটা আমার গলায় পড়িয়ে দিল এবং অন্যটি আমার হাতে দিয়ে বলল

– পরিয়ে দাওনা।

আমি পরিয়ে দিলাম। খুশীতে ওর গোলাপী গাল উজ্জল হয়ে উঠল, তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে বলল

– ফুল পরিয়ে দিলে কি হয় বল তো?

– কি হয় ?

– বুদ্ধু যেন কিছু বোঝে না?

তারপর তর-তর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘরে প্রবেশ করল আর আমিও ঘরে প্রবেশ করলাম। তারপর ও আম্মাকে ডেকে তুলে নাস্তার আয়োজন করতে রান্না ঘরে ডুকল আর আমি পড়ার ঘরে প্রবেশ করলাম। যথাসময়ে নাস্তা খেয়ে আমরা দু' জনে একত্রে বিদ্যালয়ের পানে যাত্রা করতাম। আমার ব্যাগ হতে শুরু করে সবই রোমানা গুছিয়ে দিত এক কথায় আমার সবকিছুই ও তদারকি করত। এ নিয়ে দু' জনার চলত কত মান অভিমান। ওর বাড়াবাড়ীতে আমি বিরক্ত হয়ে বলে উঠতাম – আমি কি এখনও কচি খোকা যে তুই আমাকে এভাবে চোখে–চোখে রাখবি? আমার কথা শুনে ও মিষ্টি হেঁসে বলে উঠত– খোকা নয়ত কি?

আমি আর কথা বাড়াতাম না। হাতে সুযোগ এলে চট করে বসিয়ে দিতাম এক থাপ্পড় নতুবা রাগে গর গর করতে করতে হন্ হন্ করে স্কুলের দিকে হাঁটতে শুরু করতাম। তখন ও বাধ্য হয়ে আমার পিছু পিছু হাঁটা শুরু করত। সেদিনও ব্যাতিক্রম ঘটল না। আমি বের হয়ে যাবার পর আমার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল। মুছা দাদার পরিত্যাক্ত বাড়ীর উঠোনে যে বটগাছ ছিল তার নিচে ধপ করে বসে কাঁদতে লাগল। আমি পেছনের দিকে তাকিয়ে এ দৃশ্য দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। তারপর ওর কাছে এসে বললাম

– এত ঢং করিস্ কেন? তাড়াতাড়ি আয় নয়তো স্কুলে যেতে দেরী হয়ে যাবে।

– হাত ধরে টেনে তোল।

আমি হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। শক্ত করে ও আমার হাত ধরে অবাধ্যের মত বসে রইল। আমি জোরে টান দিতেই ও উঠে পড়ল। আবার দু' জনে যাত্রা শুরু করলাম। কিছুদুর যেতে না যেতেই ওর চোখে পড়ল দু'টো তাল-গাছ। বাবুই পাখিরা অনেক যত্নে খড় কুটা দিয়ে বাসা গড়েছে। একটি বাসায় দু'টো পাখি বাসার দুই মুখে মাথা বের করে আমাদের দিকে টুলটুল করে চেয়ে আছে। তার দিকে চেয়ে রোমানা অবাক বিষ্ময় কি যেন ভাবছে।

– অ্যাই রোমানা, তাড়াতাড়ি আয়

- দেরী হয়ে যাচ্ছে।

আমার কথা শুনে রোমানা চম্‌কে উঠল। তারপর কিছুটা হেঁটে এসে একেবারে আমার সম্মুখে এসে বলে উঠল–

– দেখেছ রাহাত ভাই

– পাখি দু' টি কি সুন্দরভাবে বাসা বেঁধে আছে! বোধ হয় স্বামী–স্ত্রী।

–তুই জানিস্ তো স্বামী–স্ত্রী, পাখিদের কি বিয়ে হয়?

– হয়না আবার, না হলে বাচ্চা হয় ক্যামনে?

বস্তুত ঃ বাচ্চা হয় ক্যামনে এ কথা আমি তখনও জানতাম না। রোমানা যেন সব জান্তা, সবই জানে। আর এসব ব্যাপারে মেয়েরা বোধ হয় ছেলেদের চেয়ে আগেই বোঝে। সে সব থাক্ যা বলছি তাই বলি। এমনি করে দু' জনে স্কুলে পৌঁছেগেলাম । তারপর ছুটি শেষে বাড়ির পথে হাঁটতে লাগলাম। পথের মধ্যে রোমানা একটি কথাও বলেনি। ওর মন ভারাক্রান্ত । কোন কথা বলে নতুন বিপত্তি বাধাব না ভেবে একপ্রকার নিরব ভাবেই বাড়িতে ফিরে এলাম।

বিকেলে খেলার মাঠে প্রবেশ করে বন্ধু রফিকের কাছে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা খুলে বললাম। সব শুনে রফিক আমাকে তিরষ্কার করে বলে উঠল

– আচ্ছা রাহাত তুই সারাজীবন এমনি বোকাই থাকবি? বুঝিস্ না কেন এমন করে?

– কেন?

– পূর্ব রাগ বুঝলি?

– পূর্বরাগ কি?

– তোর মাথা!

রফিক রাগ করে চলে গেল। আমি ও কিছুক্ষন বসে থেকে সন্ধ্যাকালীন সময়ে ঘরে ফিরে এলাম। তারপর দু'টো খেয়ে-দেয়ে পড়ার টেবিলে বসলাম। রাত্রি নয়টা কি দশটা হবে। আব্বা-আম্মা দু' জনেই গ্রামবাসীদের অভ্যাস মত এই রাত্রি টুকুকে গভীর রাত্রি বানিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন এমনি সময়ে রোমানা আমার ঘরে প্রবেশ করে চেয়ারটি টেনে নিয়ে একেবারে আমার সামনে এসে বসে পড়ল। রোমানাকে সামনে পেয়ে বিকেল থেকে এখন অবধি যে প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে তা আবার ও ঘুরপাক খেতে লাগল। প্রশ্নটার সঠিক উত্তর পাবার জন্য মনটা অস্থির অশান্ত হয়ে উঠল তাই রোমানাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলাম

– আচ্ছা রোমানা পূর্বরাগ কি?

– হঠাৎ এ প্রশ্ন করছ কেন?

– না, রফিককে তোর কথা বলেছি, রফিক বলেছে.....।

– ছি! ছি! এসব কথা রফিক ভাইয়াকে বলতে গেলে কেন?

– কি করব, তোর মন খারাপ দেখে আমার ও মন খারাপ হয়েছে, খুব কান্না পাচ্ছে।

– সত্যি!

–হ্যাঁ

– এটাই হচ্ছে পূর্বরাগ।

– বুঝি না

– এত কিছু বুঝতে হবে না। তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

– আচ্ছা। তারপর চেয়ারে নড়ে-চড়ে বসে গালে হাত দিয়ে টেবিলের উপর ভর দিয়ে একাগ্রে দৃষ্টিতে অঅমার দিকে তাকিয়ে মিটি-মিটি হাঁসছে। ওর হাঁসি দেখে আমি বলে উঠলাম

– হাঁসছিস যে!

– তোমাকে দেখে।

– কেন?

– তোমার দাড়ীগুলো কেটে ফেলতে পার না?

– লজ্জা লাগবে যে!

– কাটবেনা বুঝি?

– আচ্ছা কাটব।

তুই যা আমি এখন ঘুমবো। আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেই? – আচ্ছা।

তারপে রোমানা ওর রজনীগন্ধার কঁড়ির মত আঙুল-গুলো আমার মাথার অগোছালো চুলের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে গুছিয়ে দিতে লাগল। ওর হাতের স্পর্শে আমার পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত টেস্‌টোষ্টোরণ হরমোণ জেগে উঠল। আমার সতের-আঠারো চছর বয়সে এই প্রথম কোন কুমারী মেয়ের মায়াবী হাতের স্পর্শ আমাকে মায়ার ইন্দ্রজালে বন্দি করে ফেলল। আমার ভেতরের কৈশোরকালীন যৌবনকে রোমানা একনিমেষে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল। বুঝতে পারলাম পূর্বরাগের মানে আর আমার প্রতি রোমানার আন্তরিক টানের হেতু কিন্তু মুখ ফুটে কোন কথা বের না করে নিরবে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর থেকে এমনি অভিসারে আমরা প্রায়ই মিলিত হতাম। হঠাৎ রোমানার মধ্যে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। এ যেন অন্য রোমানা,

এক পরিপূর্ণ নারী। স্নেহ – মমতা আর আদর সোহাগে আমাকে একেবারে গৃহবন্ধী করে ফেলল। বন্ধুদের আড্ডায় মন বসেনা মনটা সদাই ঘরের দিকে ছুটে আসতে চায়। দিন গুলো বেশ কাটছিলো আমাদের। কিন্তু আকস্মাৎ তারছেদ পড়ল। দাদীমার ফাতেহার দিন মসজিদের হুজুর এলেন বাসায় এবং রোমানাকে দেখলেন। দেখেই বাবাকে বললেন– মেয়েটা তো বেশ বড় হয়েছে খন্দকার সাহেব। বিয়ে – শাদীর ব্যাবস্তা করেন। এমন আঁইবুড়ো মেয়ে ঘরে থাকলে সংসারের বরকত কমে যায়। – কি বলছেন হুজুর! সবে তো চৌদ্দ...। চৌদ্দই হোক আর চব্বিশই হোক বিয়ের বয়স তো হয়েছে। – তা হয়েছে ভালো ছেলেও পাচ্ছিনা– বিয়ে ও দিতে পারছিনা। – ছেলে একটা আছে। বি, এ পাস। স্কুলের মাষ্টারী করে। – তবে সত্যিই দেখা শুরু হয়ে গেল এবং একপর্যায়ে বরপক্ষ এবং কনেপক্ষের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিয়ের দিনক্ষণ ও ঠিক হয়ে গেল। সেদিন রাত্রিকালে ঘরে বসে হারিকেনের ম্লান আলোয় বাংলা সাহিত্যের একটি গল্পে নৈর্ব্যক্তিকের জন্য পেন্সিলের লাঙল চালাচ্ছি এমন সময় আমার দ্বারের বাইরে মনুষ্য পদধ্বনী শুনলাম। এমন রাত্রিকালে এহেন শব্দ স্বাভাবতই ভীতি সঞ্চার করে তাই অত্যান্ত ভয়ার্ত হৃদে দরজা খুলে বাইরে তাকাতেই দেখতে পেলাম একটি কিশোরী এলোচুলে পুকুর ঘাটটার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম ও রোমানা। আমি পিছু পিছু অত্যান্ত সন্তর্পনে ওকে অনুসরণ করে পুকুর ঘাটটার ঐ খানে পৌঁছলাম। রোমানা আমাকে দেখতে পায়নি, পেলে থম্‌কে দাঁড়াত।

সে যাই হোক দেখলাম প্রথম যেখানে দু' জন একত্রে বসে ছিলাম সে খানটায় রোমানা ঝুপ করে বসে পড়ল, তারপর ক্ষণকাল পুকুর ঘাটটার চারিদিকে কি যেন খুঁজে বেড়ালো। তারপর শূন্য আকাশের দিকে চেয়ে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। রোমানার কান্না শুনে আমার ভেতরটায় ধক্ করে ধাক্কা দিল। আমি আর সইতে পারলাম না। কাছে গিয়ে দুই হাত দিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরলাম। আমার স্পর্শ পেয়ে ও আরও দ্রুত বেগে কাঁদতে লাগল। বড় বড় অশ্রুফোঁটা মাঘের শিশিরের মত টপ্ টপ্ করে আমার গায়ে পড়তে লাগল। ক্ষণকাল পর অশ্রু সম্বরণ করে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল – জীবনের সমস্ত স্বপ্নই অপূর্ণ রইল। সত্যিই কি দুঃখ সইবার জন্যই কি জন্ম হয়েছে আমার? – না রোমানা, দুঃখ থেকে তোকে আমি মুক্তি দেব।– কিভাবে? – চল্ পালিয়ে যাই। পালিয়ে যাবার প্রস্তাব শুনে রোমানা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে আমার হাতের বাঁধন হতে নিজেকে মুক্তকরে নিয়ে অত্যান্ত দ্রুতপদে ঘরের দিকে চলে গেল। আমি ও ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লাম কিন্তু ঘুম এলোনা। ভাবতে লাগলাম এখন কি করি? বাল্যকাল থেকেই বাবার সামনে দাঁড়িয়ে কোনদিন কিছু চাই নি, যা কিছু আবশ্যক রোমানা এবং আম্মাই ব্যাবস্থা করে দিয়েছে সেই সূত্র ধরে বাবার সামনে পড়তাম না বললেই চলে।। রাত্রিকালে শুয়ে শুয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম বাবাকে সব কথা খুলে বলব কিন্তু পরদিন সকালে বাবার সামনে গিয়ে সবকিছু বেমালুম ভুলে গেলাম, কিছুই বলতে পারলাম না। এমনি করে দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল বুকের ভেতরে ততই ব্যাথা জমে উঠতে লাগল। নিজেকে কিছুতেই আর স্থির রাখতে না পেরে লজ্জায় মাথা খেয়ে বাবার সম্মুখে গিয়ে বললাম– রোমানার কি বিয়ের বয়স হয়েছে? বাবাতো একেবারে হতবুদ্ধি। একেবারে গর্জে উঠে বললেন– তোমার

কাছ থেকে জানতে হবে? বস্তুতঃ প্রতিবাদ করার সাহস বা ভাষা আমার ছিলোনা । আর প্রতিবাদ করে কোন ফল হবে না তা ও জানি। তাই নিরবে সব মেনে নিলাম। বিয়ের দিন এল। রোমানাকে সাজিয়ে গুছিয়ে বরের সামনে বসানো হলো। আমি দুর থেকে চেয়ে দেখলাম এক কিশোরী বধূ হিসেবে যাচ্ছে পূর্ণ বয়স্ক এক যুবকের ঘরে। রোমানার পাশে ওর স্বামীকে কল্পনা করে আমি শিহ্‌রিয়া উঠলাম। নিরবে ,দু' চোখের অশ্রু বিসর্জন দেওয়া ছাড়া কিই বা করার আছে আমার তাই চোখ হতে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। সেই জল দু' পায়ে মাড়িয়ে রোমানা চলে গেল। কেই জানল না – কেই বুঝল না এ দু' টি কিশোর–কিশোরীর বিচ্ছেদের করুণ ইতিহাস। তারপর প্রায় দু'টি বছর কেটে গেছে রোমানা কে দেখিনি। আজ সকালে সর্বশেষ দেখব কখন ও কল্পনা ও করতে পারিনি।

পালা বদলের মত আমার হাত থেকে অপরের হাতে তুলে দিয়ে ছিলাম আর আজ আবার ও বিশ্ব স্রষ্টার হাতে সঁপে দিয়ে বাড়িতে ফিরছিলাম। পথের মধ্যে টু...টু...টুইপ...টুইপ শব্দ শুনে উর্ধ্বমুখে চেয়ে দেখলাম সেই তাল গাছটায় যত্নে সাজানো রাজপ্রসাদের মতো নীড়টি এখনো আছে কিন্তু দু'টো পাখির জায়গায় পাখি আছে একটি আর সেই পাখিটিই বাসার একদিকে মুখটি বেরকরে টু...টু....টুইপ...টুইপ এমনি বিষন্ন রোদনে উদভ্রান্ত পথিককে চম্‌কিত করে দিচ্ছে।

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি, গ্রাম নিতাই নগর, বড়ইগ্রাম, নাটোর, ১৬/০৩/২০০৬